# শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে কবি হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিচয় তুলে ধরতেই শুধু সক্ষম হননি, নিজের সুদৃঢ় একটা অবস্থানও তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতার স্বাতন্ত্র্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। আর এ জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একটা স্বাতন্ত্র্য অবস্থান সৃষ্টি করা। তাঁর সে অবস্থান নড়বড়ে নয়। নামের সঙ্গে তাঁর সে অবস্থানের একটা অদৃশ্য মিলও রয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতায়ও স্বশক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। শক্তি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের চিত্র নিজেই তুলে ধরেছেন। কবিতার সেই পঙ্ক্তি থেকে আলাদা করা যায় তাঁর জীবনের ইতিহাস। আবার আলাদা করা যায় তাঁর কবিতার ইতিহাসও।

শক্তি শুধু পদ্যে নয় গদ্যেও তাঁর একটা শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তবে সাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশটা একটু ভিন্ন পথে। তাঁর শুরুটা কুয়োতলা দিয়ে। তাঁর পর কত কণ্টকময় কবিতার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলেন কাব্যদিগন্তের শেষপ্রান্তে। স্পর্শ করেছিলেন উত্তপ্ত কাব্য রবিকে।

বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক লেখক রয়েছেন যারা একাধারে কবি ও কথাসাহিত্যিক। তবে তাদের অনেকেরই বলতে গেলে প্রায় সবারই অভিষেক ঘটেছে কিন্তু কবিতা দিয়ে। কবিতা দিয়ে সাহিত্য জগতের সূচনা ঘটলেও পরে আর সেই কবিসত্তা কিংবা কবিপরিচয় আলোর মুখ দেখতে পায় না। অন্য জগতের বিস্তৃত সামিয়ানার আড়ালে সে আলো হারিয়ে যায় অন্ধকার এক গিরিপথে। এ জন্য অনেক লেখকের আফসোসও রয়েছে। শুধু কবি হিসেবেই তাঁর সৃষ্টি রবির উদয়। এমন আফসোসের বাণী রবিঠাকুরেরও ছিল। সাহিত্য সৃষ্টির সব পথই তিনি করেছেন মসৃণ। তাই সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি অঘোষিত সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর অবর্তমানেও সে আসন এত বেশি শক্তিশালী যে, অন্যকারও পক্ষে দখল করা সম্ভব হচ্ছে না। এতকিছুর পরও তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি কবি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত দুই কবি সৈয়দ শামসুল হক ও নির্মলেন্দু গুণ, এদের মুখেও এ আফসোসের বাণী রয়েছে। এখানেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা। কারণ তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কুয়োতলা দিয়ে আর এটা ছিল একটি উপন্যাস। শক্তির সৃষ্টি সম্ভারের ভেতর অন্যতম। কিন্তু কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয় নেই। কবি হিসেবেই তাঁর পরিচয় ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল দুই বাংলায়। কবি খ্যাতি লাভ করার পেছনে নিশ্চই তাঁর কাব্যসত্তার বিজয় সূচিত হয়েছে। তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয় তাঁর কাব্যসত্তার আবির্ভাব হঠাৎ করে হয়নি। এ সত্তা হয়ত সুপ্ত ছিল। আর না হয় কবিসত্তাকে তিনি গদ্যসত্তার আড়ালে রেখেছিলেন সাহিত্যকে জীবিকা করার উদ্দেশ্যে। এ জন্যই গদ্য দিয়ে তাঁর সূচনা। আবার অনেকটা কবি বন্ধু সুনীলের তাগিদে কিংবা সাগরময় ঘোষের দাবিকে মান্য করেই গদ্যচর্চায় এগিয়েছেন।

শক্তির কবিতাও একটু ভিন্ন স্বাদের। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে, সমুদ্র, নদী, বৃষ্টি, গাছগাছালি, আকাশ, নক্ষত্র, জঙ্গল, মহুয়া, ফুল, বীজ, টিলা, জ্যোৎস্না, ঝিঁঝি, মেহেদি পাতার ঝোপ, রাত্রি, অন্ধকার, দিন সন্ধ্যা, পাহাড়, পাথর, জীবন-মৃত্যু, জীবনের স্বপ্ন আশা, ক্লেশ আবার ভালবাসা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় চল্লিশের অধিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৮৩ সালে, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য মার্চ ১৯৬১ প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতার সংখ্যা ৭২।

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো অক্টোবর ১৯৬৫

অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে জুলাই ১৯৬৬

পুরোনো সিঁড়ি আনুমানিক ১৯৬৭

সোনার মাছি খুন করেছি জুলাই ১৯৬৭

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান মার্চ ১৯৬৯

চতুর্দশপদী কবিতাবলী মে ১৯৭০

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি নভেম্বর ১৯৭১

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই আগস্ট ১৯৭২

সুখে আছি ১৫ এপ্রিল ১৯৭৪

ঈশ্বর থাকেন জলে মে ১৯৭৫

জ্বলন্ত রুমাল মে ১৯৭৫

অস্ত্রের গৌরবহীন একা মে ১৯৭৫

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অক্টোবর ১৯৭৫

সুন্দর এখানে একা নয় জুন ১৯৭৬

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ডিসেম্বর ১৯৭৬

এই আমি যে পাথরে অগস্ট ১৯৭৭

কবিতার তুলো ওড়ে মার্চ ১৯৭৭

হেমন্ত যেখানে থাকে ১৮ এপ্রিল ১৯৭৭

পাতাল থেকে ডাকছি মে ১৯৭৭

উড়ন্ত সিংহাসন ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

মানুষ বড়ো কাঁদছে আগস্ট ১৯৭৮

ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি ডিসেম্বর ১৯৭৮

পরশুরামের কুঠার ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

ভাত নেই, পাথর রয়েছেজুলাই ১৯৭৯

আমাকে দাও কোল ১৪ মার্চ ১৯৮০

আমি চলে যেতে পারি এপ্রিল ১৯৮০

মন্ত্রের মতন আছি স্থির বৈশাখ ১৩৮৭

অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল জুলাই ১৯৮০

আমি একা বড়ো একা মে ১৯৮০

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ জানুয়ারি ১৯৮২

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো মার্চ ১৯৮২ (সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার - ১৯৮৩)

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ১৯৮৩

কক্সবাজারে সন্ধ্যা ১৯৮৪

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি ১৯৮৫

সন্ধ্যায় সে শান্ত উপহার আগস্ট ১৯৮৬

এই তো মর্মরমূর্তি জানুয়ারি ১৯৮৭

বিষের মধ্যে সমস্ত শোক মে ১৯৮৭

আমাকে জাগাও ১৯৮৯

ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে  জানুয়ারি ১৯৯১

পাতালে টেনেছে আজ  জুলাই ১৯৯১

জঙ্গল বিষাদে আছে  জানুয়ারি ১৯৯৪

একজন লেখকের লেখার মূল উৎস হচ্ছে তাঁর কল্পনা শক্তি। আর এ শক্তির উৎস হচ্ছে বাইরের জগৎ। বাইরের জগতের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, রূপ-রস-গন্ধ সবই একজন শিল্পীর মনে দোলা দেয়। শিল্পীর মনকে উদ্বেলিত করে। জাগিয়ে তোলে মাধুর্যপূর্ণ এক নতুন ভাবানুভূতি। শিল্পীর মনে সৃষ্ট এই অনুভূতি যখন মনের মাধুরী দ্বারা শিল্পসম্মত রূপে ছন্দবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় তখন সাধারণ একটা বিষয়ও অসাধারণ শিল্প হয়ে ওঠে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সে শক্তি ছিল। সে জন্যই শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমন হৃদয়স্পর্শী কালজয়ী জনপ্রিয় কবিতা লিখতে পেরেছেন। ‘কবি ও কাঙাল’ কবিতাটি তাঁর সেই শক্তিশালী জ্যোতির্ময় কাব্যসত্তার প্রতিনিধিত্ব বহন করছে।

‘কিছুকাল সুখ ভোগ করে, হোলো মানুষের মত

মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।

মারা গেলে মহোৎসব করেছিলো প্রকাশকগণ

কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না

সন্ধ্যেবেলা সেজেগুঁজে এসে বলবে না, টাকা দাও

নতুবা ভাঙচুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা,

চটজলদি টাকা দাও-নয়তো আগুন দেবো ঘরে।

অথচ আগুনেই পুড়ে গেলো লোকটা, কবি ও কাঙাল!’

এ কবিতায় কবি অতি সাধারণভাবে কিছু মনোকথা এবং ব্যথা প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর শিল্পায়িত রূপের কারণে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে। যার ভেতর রয়েছে ক্ষোভ সমালোচনা আবার কবির মৃত্যুতে প্রকাশকের হাঁফছেড়ে বাঁচার এক মহোৎসব। ম্যানু আর্ণল্ডের ভাষায় এর নামই কবিতা। তিনি কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"Poetry is at bottom a criticism of life; that greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life... to the question how to live."

অর্থাৎ কবিতা প্রকৃত পক্ষে কাব্যসত্তা ও কাব্য সৌন্দর্যরূপে মানবজীবনের সমালোচনা। ‘কবি ও কাঙাল’ কবিতাটি আসলে সমালোচনামূলক কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবি প্রকাশকদের আসল চরিত্রটি তুলে ধরেছেন। লেখকরা লেখেন তাঁর চিন্তার সব ফসল নিয়ে বাণিজ্য করে লাভবান হচ্ছেন প্রকাশক। একজন লেখককে কতভাবে প্রকাশকরা ঘুরাচ্ছেন। শুধু প্রকাশকদেরই সমালোচনা করেননি। কবি নিজেরও সমালোচনা করেছেন। কবিতা লেখা সম্মানীর জন্য কতবার ওই প্রকাশকদের বাড়িতে ধর্ণা দিতে হচ্ছে। কবিরাও তো কাঙাল!

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি কবিতার কথা না বললেই নয়। কবিতাটি হচ্ছে ‘অবনী বাড়ী আছো’। এ কবিতাটি ১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংকলনে তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার কয়েকটি চরণ এখানে উল্লেখ করা হলো-

‘দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া

কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া

অবনী বাড়ী আছো?

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

.....

কিন্তু এখনি যাবো না

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো

একাকী যাবো না, অসময়ে।'

'অবনী বাড়ী আছো' এ কবিতায় কবি নিজেকেই অবনী রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে এ পদ্যের জন্মের কথা শক্তি এরকমভাবে বলেছেন, নির্জন বাড়িতে মহুয়ার বোতলকে সঙ্গী করে কবি যখন সামনে মেঘদূত মালাকে দেখলেন তখন তাঁর মনে হলো অসংখ্য গরু যেন যাত্রা করেছে। মেঘেরা গাভীর মতো চড়ে বেড়াচ্ছে। অবনী দুয়ার এঁটে ঘুমিয়েছেন, কে বা কারা যেন তার দরজার কড়া নাড়ছে। কে যেন তাকে ডাকছে আয় আয়। অবনী যেতে চায়নি। অবনী বলছে তুমি আমায় ডাকছ আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু কেন যাব? আমারতো একটা ছোট্ট শিশুসন্তান রয়েছে ওর মুখ ধরে চুমু খাব। এই যে পারিবারিক মায়া-মমতা কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাচ্ছে। পরক্ষণেই হয়ত কবি আবার বুঝতে পারলেন যে, সে ইচ্ছে করলেই থাকতে পারবে না। চলে তার যেতে হবে। কোন মমতার বন্ধন সন্তানের লাবণ্যময় মুখ তাকে আঁকড়ে রাখতে পারবে না। এ সব ভেবে কবি আবার বললেন, আমি যাব কিন্তু এখনি যাব না।

কবি চেয়েছিলেন আরও কিছুদিন এখানে অবস্থান করতে। একা নয়, আরও অনেককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ সব অবজ্ঞা করে আবার নিজেই চলে গেলেন। সবাইকে রেখে। সেই ১৯৯৫ সালের কথা। ২৩ মার্চ কবি অন্য ভুবনের যাত্রী হয়ে চলে গেলেন বহু দূরে।

পঞ্চাশ দশকের অন্যতম তরুণ বাঙালী কবি ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের আন্যতম শক্তিমান কবি হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান লক্ষণীয়। গদ্য দিয়ে সাহিত্য জীবনের অভিষেক হলেও তিনি আপাদমস্তক ছিলেন একজন কবি। কবিতা তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করেছিল। সে কবিত্ব তাঁর ফ্যাশনে আর ভূষণে নয়। চিন্তা-চেতনায়, ভাষা-শৈলী ও ভাষার বৈপরীত্য দেখা গেছে তাঁর লেখনির ভেতর। শব্দের মধ্যে প্রাণ শব্দের মধ্যে মৃত্যু তাঁর কবিতায়ই ফুটে উঠেছে। তাছাড়াও তাঁর কথাবার্তায় চালচলনে পুরো জীবনই কবি সত্তার ঘেরাটোপে ছিল বাঁধা।

তাঁর সময়েই বাংলাসাহিত্যে কবিতা আবার নতুন করে লেখা শুরু হয়। কবিতার আধুনিকতার উৎস খুঁজতে গিয়ে শক্তি কবিতার রাজ্য তছনছ করে দেবার ভূমিকা নেন। যার জন্য তাঁর কবিতাকে বলতে হয় পদ্য। তিনি নিজেও তাঁর কবিতাকে পদ্য বলেছেন। কবিতার পথের শেষ কোথায়, কোথায় ক্লান্ত চরণ থামবে এর একটা অদৃশ্য ইঙ্গিতও রয়েছে তাঁর কবিতায়।

মানুষ হিসেবেও শক্তি ছিলেন আশ্চর্য ধরনের। তাঁর নামে অনেক সত্য মিথ্যা গল্প প্রচলিত রয়েছে। অদ্ভুত সেসব গল্প বিশ্বাস করার মতোও নয়। তবে সে গল্পগুলো তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বেশ মানিয়েও যেত। অবিশ্বাস করতেও এক প্রকার কষ্ট হতো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক কবিতায় শক্তির এ সব অদ্ভুত সব চরিত্র তুলে ধরেছেন।

'রাত বারোটা কি দেড়টায় কবিতার খাতা খুলতেই বাইরে

কে আমার নাম ধরে তিনবার ডাকলো?

গলা চিনতে ভুল হবার কথা নয়, তবু একবার কেঁপে উঠি

এই তো তার আসবার সময় বরাবরই তো সে রাত্রির রুটিনে

পদাঘাত করে এসেছে

দুনিয়ার সমস্ত পুলিশ তাকে কুর্নিশ করে, রিকশাওয়ালারা ঠুং ঠুং

শব্দে হুল্লোড় তোলে

গ্যারাজমুখী ফাঁকা দোতলা বাসের ড্রাইবার তার সঙ্গে এক বোতল থেকে চুমুক দেয়

উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি মেরে বলি, শক্তি চলে এসো,

দরজা খোলা আছে

খাঁকি প্যান্ট ও কালো জামা, মাথার চুল সাদা, মুঠোয় সিগেরেট ধরা

শক্তি একটু একটু দুলছে, জ্যোৎস্না ছিন্নভিন্ন করে হেসে উঠলো’

এই কবিতয়ি শক্তির জীবনের কিছু অদ্ভুত চরিত্র উঠে এসেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আর এক বন্ধু সমীর বাবু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক নয়টি লেখা নিয়ে একটি বই করেছেন ‘আমার বন্ধু শক্তি’। সেখানে তিনি তুলে ধরেছেন কবির ব্যক্তি জীবনের নানা ছোটখাটো অনুষঙ্গ, যা দিয়ে খুব সহজেই মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। আবার নিঃসঙ্গ শক্তিকে চেনা যায়। সেই শক্তি কেমন ছিলেন। স্বাগত-তে সঙ্কলক লিখেছিলেন ‘হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিবে ওর বিরোধ সব শুধু নিজের সঙ্গে, ও পালাতে চায় শুধুমাত্র নিজের কাছ থেকে। নিজে ছাড়া আর সকলেই ওর বন্ধু। সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠতা, অথচ ভিতরে ভিতরে এত সুদূর এমন মানুষ আর দেখব না। সামাজিকতার সম্পর্ক পার হয়ে বাক ও অর্থের হানাহানি শেষ হবার পর একটা জায়গায় শক্তির মতো নিঃসঙ্গ কেউ ছিল না। অমন অনুপস্থিত মানুষ আর কখনও দেখিনি।’

সমীর বাবু আরও বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের যে দু’জন কবির চলে যাওয়ার স্মৃতিকথন আমাকে কাঁদায় এখনও মন খারাপের দিনমান ভাসায় তাঁরা দুজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ও শক্তি।’

পঞ্চাশ দশকের কবিরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা তেমন পছন্দ করতেন না। তবে তাঁর গান ছিল প্রায় সকলেরই পছন্দের। সকলেই ছিলেন তাঁর গানের ভক্ত। শক্তি, সুনীল সবার কণ্ঠেই রবীন্দ্রনাথের গানে সুর পেয়েছে। এমনকি শক্তির পদ্যের বাঁকে বাঁকে রবিঠাকুরের গানের চরণ চিহ্ন পাওয়া যায়। তাই সমীর বাবু লিখেছেন, বুঝতে পারি শক্তি কেন বছরের পর বছর ধরে চলে যেত কেঁদুলির মেলায় নদীর ধারের ওই বীরভূমের খোলা মাঠে। জানুয়ারি মাসের ঠা-ায় রাতের পর রাত কাটিয়ে দিত বাউলদের আখড়ায়।

শক্তি নিজেও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালবেসেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। যেমন ‘মরিলো মরি’ গানটিতে যখন ‘ওই যে বাহিরে বেজেছে বাঁশি বল কি করি’ এই লাইনটি শোনামাত্রই ‘বাহির’ যেন চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে আসে, শক্তির দেখা ঝাপসা জগতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে গানের স্বরে ও সুরে। শক্তির আরও একটি স্বীকারোক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায় ‘আমি যখন মদ্যপান করতে করতে নিজের মধ্যে চলে যাই তখন রবীন্দ্রনাথের গান আমার ভিতর বাহিরকে একাকার করে দিয়ে যায়। তখন গলার সবটুকু জোর ও উদারতা দিয়ে ওঁর গান গাইতে ইচ্ছে করে।’

রবীন্দ্রনাথের গান শক্তিকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। নবীনদাস বাউলকে নিয়ে লেখা শক্তির এলিজি থেকে তা খানিকটা বোঝা যায়।

‘কবি মোর রেখে গেল ছিন্ন হতে স্মারক মর্মর...

নীরবে কেমন আছি ভালবেসে আমৃত্যু সংযত!’

শক্তি ছিলেন হাংরি আন্দোলনের অন্যতম কবি। ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাসে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে যে চারজন কবিকে হাংরি আন্দোলনের জনক মনে করা হয় সেখানে শক্তির সঙ্গে ছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায় এবং মলয় রায়চৌধুরী। পরে এই তিনজনের সঙ্গে শক্তির সাহিত্যিক মতান্তর সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালে হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন শক্তি। হাংরি আন্দোলনে থাকাকালে প্রায় পঞ্চাশটির মতো বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন। শক্তি যখন হাংরি আন্দোলন করেন সুনীল এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। এমনকি কৃত্তিবাস পত্রিকায় এ নিয়ে ১৯৬৬ সালে সম্পাদকীয়ও লিখেছেন। পরবর্তীকালে কবি সুনীল ও শক্তির নাম সাহিত্যিক মহলে এক সুতোয় গাঁথা মালা হয়ে যায়।

সব কিছুর পরেও শক্তির কবিতাকে ঘিরে বিপুল বিস্ময় এবং বিতর্ক বার বার পাঠকদের আন্দোলিত করেছে। শক্তির কবিতা বাঙালীর এবং বাংলা সাহিত্যের চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে। শক্তির বোহেমিয়ান জীবন ও তার বয়ে চলাও রয়ে যাবে বাঙালী পাঠকের স্মরণে চিরকাল।

তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ